সূচিপত্র

বইটি যাদের জন্য নয়	১৩
আমরা যা শিখতে যাচ্ছি	১৬
সবার আগে দরকার দক্ষতা	১৮
নিজেকে তৈরি করুন	২২
স্বভাব বদলে ফেলুন	২৬
হতে হবে সবার সেরা	২৯
কে আপনার বেশি প্রিয়?	৩৩
দক্ষতা কাজে লাগান	৪১
গরিব-দুঃখীদের ভালোবাসুন	৪৬
নারীদের সম্মান করুন	৪৯
শিশুদের মনোবৃত্তি বুঝুন	৫৭
অধীনস্থদের প্রতি সদয় হোন	৬৪
প্রতিপক্ষের সাথে সদাচার করুন	৬৮
জীবজন্তুর প্রতি দয়াশীল হোন	৭৯
মানুষের হৃদয় জয় করুন	৮৩
নিয়ত ঠিক করুন	৮৮

ভুল শোধরানোর সঠিক পদ্ধতি	২৮৫
কাজ করুন কৌশলে	২৯৩
ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলুন	৩০০
যার কোনো সমাধান নেই	৩০৬
দুশ্চিন্তা কোনো সমাধান নয়	৩০৮
আল্লাহর দানে সন্তুষ্ট থাকুন	৩১২
হয়ে উঠুন পাহাড় যেমন	৩১৮
পাপকে ঘৃণা করুন, পাপীকে নয়	৩২৪
ভাগ্য উপভোগ করুন	৩২৭
মতভেদকে বিভেদের কারণ বানাবেন না!	৩৩০
কোমলতা মানুষের সৌন্দর্য বাড়ায়	৩৩৪
জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন না	৩৪৫
মিষ্টি ভাষায় কথা বলুন	৩৫৮
উপদেশ দিন সংক্ষেপে	৩৬৬
অন্যের কথায় কান দেবেন না	৩৭১
প্রাণ খুলে হাসুন	৩৭৪
পরিমিতিবোধ বজায় রাখুন	৩৭৮
গোপন কথা গোপনই রাখুন	৩৮৩
মানুষের প্রয়োজনে এগিয়ে আসুন	৩৯০
যা পারবেন না, তা করতে যাবেন না	৩৯৫
বিড়ালটিকে লাথি মারল কে?	৪০১
মানুষের প্রতি বিনয়ী হোন	৪০৯
গোপন ইবাদত	৪১২
মানুষকে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচান	৪২০
বাহ্যিক বেশভূষায় যত্নবান হোন	৪২৩
সদা সত্য বলুন	৪২৭

কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলুন	৪৩১
নীতিতে অটল থাকুন	৪৩৪
প্রলোভনে গলে যাবেন না	৪৩৮
ক্ষমা করতে শিখুন	৪৪৩
উদারতায় হোন অনন্য	৪৫৩
কারও কষ্টের কারণ হবেন না	৪৬০
কাউকে শত্রু বানাবেন না	৪৬৪
জিহ্বা যখন নিয়ন্ত্রক	৪৬৬
জিহ্বা সংযত রাখুন	৪৭৩
হৃদয়ের জানালা	৪৭৭
হৃদয়ে খুলুন ভালোবাসার সঞ্চয়ী হিসাব	৪৮৫
কথায় জাদুময়তা আনুন	৪৮৯
কাজে না পারলে কথায় অন্তত খুশি করুন	৪৯৮
অন্যের জন্য দুআ করুন	৫০৭
ভুল হলে শুধরে নিন	৫২১
একচোখা নীতি পরিহার করুন	৫২৫
মন দিয়ে শুনুন	৫২৯
বিতর্কে দক্ষ হোন	৫৩৪
শুরুতেই আপত্তির দরজা বন্ধ করে নিন	৫৪০
আপত্তি তোলার আগে আরেকবার ভাবুন	৫৪৪
আবেদনের শুরুতে ভূমিকা যোগ করুন	৫৪৮
সবসময় সফল হওয়া জরুরি নয়	৫৫৭

বইটি যাদের জন্য নয়

একবার আমার মোবাইলে ছোট্ট একটি মেসেজ আসে, 'শাইখ, আত্মহত্যার বিধান কী?'

আমি মেসেজের কোনো উত্তর না দিয়ে সরাসরি ওই নম্বরে ফোন করি। ওপাশ থেকে উঠতি বয়সি এক তরুণ কল রিসিভ করে। তাকে বিনয়ের সাথে বলি, 'দুঃখিত, তোমার প্রশ্নটি বুঝতে পরিনি! দয়া করে বুঝিয়ে বলবে কি?'

সে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়, 'প্রশ্ন তো স্পষ্টই। আমি জানতে চাইছি আত্মহত্যার বিধান কী?'

আমি তাকে অপ্রত্যাশিত উত্তরে চমকে দিতে চাই, 'আত্মহত্যা করা মুস্তাহাব।'

উত্তেজনায় সে চিৎকার করে ওঠে, 'কী, কী বললেন!'

সামলে ওঠার আগেই তাকে জিজ্ঞেস করি, 'এবার বলো, আত্মহত্যার সহজ একটি পথ বলে দিয়ে আমি কি তোমাকে সাহায্য করব?'

আমার উৎসাহ দেখে সে দমে যায়। তাকে অভয় দিয়ে বলি, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তুমি চাইলে আমাকে বলতে পারো, ঠিক কী কারণে এমনটা করতে চাইছ?'

সে জানায়, 'আমি বেকার। বহু চেষ্টা করেও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারিনি। কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না। আমি চরম ব্যর্থ...'

এরপর সে তার ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনার লম্বা এক গল্প শোনায় আমাকে। আমার মনে হয়, সে নিজেকে যতটা অক্ষম আর অসফল বলে চিত্রায়িত করছিল, বাস্তবে ঠিক ততটা

নয়। আল্লাহ তাকে এটুকু যোগ্যতা দিয়েছিলেন, যা কাজে লাগিয়ে সে অনায়াসেই সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারত। কিন্তু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও হতাশাবোধ তাকে তার শক্তির উৎস খুঁজে পেতে দেয়নি। ফলে সে আর নিজেকে চিনে উঠতে পারেনি।

আজকালকার যুবকদের এটা একটা সাধারণ সমস্যা। কেউই নিজের ভেতরে একটু উঁকি দিতে চায় না। জানার চেষ্টা করে না নিজের পরিচয়টা। জীবনের যে সময়টায় প্রচেষ্টার বলে নিজেকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার কথা, সেসময়টায় সফল মানুষদের দিকে তাকিয়ে তারা নিজেদের ঠেলে দেয় হতাশার অতলে।

সফলদের দিকে তাকিয়ে আমাদের যুবকেরা কেন নিজেদের ছোট করে দেখে? কেন তাদের ভেতরে এ প্রত্যয় জাগে না—অন্যরা পারলে আমি কেন পারব না? অন্তত চেষ্টা তো করে দেখতে পারি? নিজের মতো করে শুরু করতে সমস্যা কোথায়? এদেরকে লক্ষ্য করেই হয়তো কবি বলেছেন—

পাহাড়-চূড়ায় আরোহণে যার ভয়
আমরণ সে ভূতলেই পড়ে রয়।

প্রিয় পাঠক, আপনি কি জানেন, বইটি কাদের জন্য নয়?

তারা হলো সেসব দুর্ভাগা—যারা ভুলকে ভয় পায়, ব্যর্থ হতে পারে ভেবে কাজই শুরু করে না, ভাগ্যের কাছে অসহায় মনে করে নিজেকে। সেইসাথে জ্ঞানীর মতো বলে—'আমি জন্মেছিই এভাবে। মানুষ তো তা-ই বলে। আমার যা আছে, এতেই আমি খুশি। আমার দ্বারা নিজেকে বদলানো সম্ভব নয়। আমি খালিদের মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। পারি না আহমাদের মতো সবসময় হাসিখুশি থাকতে। আর যিয়াদের মতো খ্যাতি অর্জন করা তো আমার পক্ষে অসম্ভব!'

মনে পড়ে, একবার আমি এক সেমিনারে অতিথি হয়েছিলাম। সেমিনারটি ছিল সাধারণ পর্যায়ের। আমন্ত্রিত লোকজনও ছিল সেরকম। আহামরি যোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না কাউকে। সেমিনার শুরু হওয়ার আগে খেয়াল করি, এক রসিক বৃদ্ধ চুটিয়ে গল্প করছেন তার পাশের লোকটির সাথে। তার যে বয়স, সে কারণে তিনি সবার সম্মানের পাত্র হওয়ার কথা। কিন্তু তার চপলতার কারণে সেরকম কিছু চোখে পড়ছিল না।

সেমিনার শুরু হলে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে সেখানে আমি শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু বাযের একটি ফতোয়া উল্লেখ করি। আলোচনা শেষ হলে সেই বৃদ্ধ আমার কাছে এসে গর্ব করে বলেন, 'আপনি জেনে অবাক হবেন, ইবনু বায আমার সহপাঠী। আজ থেকে ৪০ বছর আগে আমরা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিমের কাছে

একসাথে পড়েছি।'

আমি লক্ষ করি, এ তথ্যটি জানাতে পেরে তিনি ভীষণ খুশি। তৃপ্তির উজ্জ্বল আবেশ ছড়িয়ে আছে তার সমস্ত চেহারায়। কোনো একসময় সফল এক ব্যক্তির সঙ্গ পেয়েছিলেন বলে বর্তে গেছেন যেন!

তার এ উচ্ছ্বাস দেখে বারবার আমার মনে হতে থাকে—প্রিয়, তাহলে তুমি কেন পারলে না ইবনু বাযের মতো সফল হতে? তুমিও তো একই পথের পথিক ছিলে। তারপরও কেন পৌঁছতে পারলে না গন্তব্যে? ইবনু বাযের মৃত্যুতে যেখানে মিহরাব কাঁদে, মিম্বার কাঁদে; কাঁদে জ্ঞানকেন্দ্র ও বিচারালয়—সেখানে তোমার মৃত্যুর পরে কে স্মরণ করবে তোমাকে? কে দুফোঁটা অশ্রু ফেলবে তোমার জন্য? কেউ না। সৌজন্য দেখানো কিংবা সমাজের সাধারণ নিয়মের অনুসরণ ছাড়া কেউই কাঁদবে না তোমার জন্য।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি—অমুকের সাথে আমার ভালো পরিচয়, সে তো আমার দীর্ঘদিনের সহপাঠী, তমুকের সাথে ওঠাবসা ছিল আমার—এসব বলে অবচেতনেই নিজেদের পরিচয়কে গৌরবান্বিত করতে চাই। কিন্তু এতে আসলে প্রকৃত গৌরব নেই। গৌরব মূলত নিজেকে তাদের উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার মধ্যে।

তাই সাহস রাখুন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন। দক্ষতা কাজে লাগান। দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলুন। হতাশাকে পরিণত করুন হাসিতে। দুশ্চিন্তাকে বিদায় দিন। সবসময় হাসিখুশি থাকুন। কৃপণতা ছেড়ে দিন। বাড়িয়ে দিন দানের হাত। রাগ-ক্রোধ হজম করুন। কাজ করুন ধৈর্যের সাথে। বিপদের মধ্যেও খুঁজে বের করুন আনন্দ। ঈমানকে গ্রহণ করুন এমন অস্ত্র হিসেবে, যা দিয়ে সবকিছুকে জয় করে নেবেন।

সহজ কথায়, জীবন উপভোগ করুন। পার্থিব জীবন খুব সংক্ষিপ্ত। এখানে দুশ্চিন্তার অবকাশ নেই। কিন্তু দুশ্চিন্তার আবর্তে থেকে কীভাবে আপনি জীবনকে উপভোগ করবেন—এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই এই গ্রন্থের গ্রন্থনা। আমাদের সঙ্গে থাকুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাকে পৌঁছে দেব গন্তব্যে!

সতীর্থ

এ পথচলায় কেবল তারাই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেন, যাদের প্রতিজ্ঞা করার মতো একটি মন আছে; সেইসাথে আছে দক্ষতা অর্জনে লেগে থাকার মতো মনোবল এবং তা কাজে লাগানোর সক্ষমতা।

সবার আগে দরকার দক্ষতা

একবার আমি বক্তৃতা করতে যাই এক দারিদ্র্যনিপীড়িত এলাকায়। স্থানীয় ও দূরদূরান্ত থেকে আগত অনেক জ্ঞানীগুণী লোক অংশ নেন সে অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শেষে এক স্কুলমাস্টার আমার সাথে দেখা করতে আসেন। বহুদূর থেকে এসেছেন তিনি আমার বক্তৃতা শুনতে। ভদ্রলোক সংক্ষেপে পরিচয়পর্ব সেরে আমাকে বলেন, 'কজন শিক্ষার্থীর ব্যয়ভার বহনে আপনি আমাদের সাহায্য করুন!'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'স্কুল তো সরকারি, শিক্ষাও অবৈতনিক। এখানে শিক্ষাব্যয় বহনের সুযোগ কোথায়? এ প্রশ্নই-বা আসে কোত্থেকে?'

'আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকি।'

'কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তো সরকারি ও অবৈতনিক। তাছাড়া সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।'

'দয়া করে একটু সময় দিন। পুরো বিষয়টা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'আমাদের এখানে শিক্ষার হার যথেষ্ট ভালো। শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থীই কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক স্কুল থেকে লেখাপড়া সম্পন্ন করে। এদের সিংহভাগই প্রচণ্ড মেধাবী এবং অনন্য প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু তাদের কেউই মাধ্যমিক স্তর ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে পারে না। বাইরের কোনো কলেজ-ভার্সিটিতে গিয়ে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামিক ল অথবা কম্পিউটার সাইন্সে উচ্চশিক্ষা নিতে চাইলে তাদের বাবারা বাদ

সাধেন—যথেষ্ট লেখাপড়া করেছ বাবা! এবার আমার সাথে ছাগল চরাও।'

'কী, লেখাপড়া বাদ দিয়ে ছাগল চরাবে?' নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠি।

'হ্যাঁ, ছাগল চরাবে। এটাই তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত। অসহায় শিক্ষার্থীদের এ সিদ্ধান্ত না মেনে উপায় নেই। তাই তারা ছাগল চরানোর কাজে লেগে যায়। এভাবে অঙ্কুরিত হওয়ার আগেই বিনষ্ট হয়ে যায় তাদের অমিত মেধা ও প্রতিভা। বছরের পর বছর আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা ছাগল চরাতে থাকে।'

'এর কোনো সমাধান ভেবে দেখেছেন?'

'আমরা একটা সমাধান খুঁজে বের করেছি। তা হচ্ছে, একজন রাখালের খরচ বাবদ প্রত্যেক বাবাকে কয়েক শ রিয়াল বার্ষিক ভাতা দিই। এতে তাদের সন্তানরা মেধা বিকাশের সুযোগ পায়। দেশ ও সমাজের সেবায় কাজে লাগে তাদের দক্ষতা ও প্রতিভা। কলেজ-ভার্সিটিতে যাওয়ার পর গ্রাজুয়েশন শেষ করা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকি। আমাদের তরুণদের মেধা ও প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে আর আমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখব—তা তো হতে পারে না; হতে দেওয়া যায় না।'

শেষ কথাগুলো বলার সময় ভদ্রলোকের গলা ধরে আসে। আনমনা হয়ে মাথা নিচু করে রাখেন কিছুক্ষণ।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ আমি তার কথাগুলো নিয়ে ভাবি। তখন মনে হয়, এভাবে মেধার অপচয় হতে দেওয়া উচিত না। যাদের সহজাত প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা আছে, তারা সেগুলো কাজে না লাগালে অথবা তাদের সুযোগ করে দিতে না পারলে, আমরা জাতি হিসেবে কখনোই উন্নত হতে পারব না।

আরেকটা বিষয়, সবকিছুতে সবার সহজাত দক্ষতা বা আকর্ষণ থাকতে হবে—তা কিন্তু জরুরি নয়। তবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে অথবা সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হলে, অবশ্যই আপনাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

দক্ষতা ছাড়াই সফলতা পেয়ে যাবেন—এমনটা ভাবা অবান্তর। জ্ঞানবিজ্ঞান বলুন কিংবা অন্য কোনো শাস্ত্র বা পেশা—সব জায়গায় কেবল তারাই সফল হয়, যারা তাদের কর্ম ও পেশায় রাখতে পারে দক্ষতার স্বাক্ষর। সংসারের ক্ষুদ্র গৃহকোণ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহৎ পরিসর—সবখানে এটাই সফলতার পূর্বশর্ত।

তবে এটা সত্য, আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে সহজাত প্রতিভা ও দক্ষতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। সেসব কাজে লাগিয়ে তারা সফলতার শিখর স্পর্শ করে। অনেক সময় আলাদা করে অনুভবও করতে পারে না—ঠিক কী কী কর্মদক্ষতার কারণে তারা আজ

সফল। আবার কিছু মানুষ জন্মসূত্রে এ দক্ষতা পায় না। তাদের এটা অর্জন করতে হয় শিক্ষা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তারপর একে কাজে লাগিয়ে পৌঁছতে হয় সফলতার শিখরে।

এখানে আমরা কথা বলব দ্বিতীয় শ্রেণির সফলদের নিয়ে। তাদের জীবন পাঠ করব। জীবনের বাঁকবদলগুলো দেখব গভীর দৃষ্টিতে। এরপর দেখব, ঠিক কোন পথে তারা সফলতার সন্ধান পেয়েছেন এবং কীভাবে নিজেদের নিয়ে গেছেন উন্নতির শীর্ষ চূড়ায়? এতে তাদের পথে চলা এবং তাদের মতো নিজেদের সাফল্যমণ্ডিত করা আমাদের জন্য সহজ হবে।

কিছুদিন আগে পৃথিবীর শীর্ষ ধনকুবের সুলাইমান রাজিহির একটি সাক্ষাৎকার শুনেছি। চিন্তা ও চরিত্রে তাকে মনে হয়েছে পাহাড়ের মতো বিশাল ও অবিচল। তিনি এখন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক। স্থাবর সম্পত্তিরও অভাব নেই তার। দানের হাতও প্রশস্ত। এ পর্যন্ত কয়েক শ মসজিদ নির্মাণ করেছেন তিনি। হাজার হাজার এতিম-অনাথের ভরণপোষণও করে যাচ্ছেন নিয়মিত। সবদিক থেকেই তিনি একজন সফল মানুষ।

সাক্ষাৎকারে তিনি তার সংগ্রামী জীবনের শুরুর অবস্থা নিয়ে অকপট কথা বলেন। ৫০ বছর আগে যখন ভাগ্যের সন্ধানে বের হন, তখন তিনি ছিলেন নিতান্ত সাধারণ গোছের একজন মানুষ। দিন এনে দিন খেতেন। কোনো কোনো দিন সেটাও জুটত না কপালে। দুমুঠো খাবারের জন্য মজুর খাটতেন। মানুষের ঘরদোর পরিষ্কার করতেন। অনেক সময় দোকানের কর্মচারী অথবা অফিসের পিয়ন হিসেবে দিনরাত পরিশ্রম করতেন।

সেই ছন্নছাড়া অবস্থা থেকে কীভাবে তিনি সফলতার চূড়ায় পৌঁছলেন এবং এখনো ওপরে উঠেই চলেছেন, তার পুরোটা তুলে ধরেন সে সাক্ষাৎকারে।

আমি তার মেধা ও দক্ষতা এবং এ দুয়ের সমন্বয়ে পাওয়া সফলতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি। তখন মনে হয়, আমরাও চাইলে তার মতো সফল হতে পারি। তবে এজন্য আমাদের কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে; অধ্যবসায়ের সাথে করে যেতে হবে কঠোর পরিশ্রম।

এজন্য আমরা সবার আগে দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করব। কারণ আমাদের অনেকেই অসামান্য সৃষ্টিশীলতা নিয়ে জন্মে। কিন্তু সহজাত প্রতিভা সম্পর্কে সবার সমান বোধ থাকে না। কেউ সেটা অনুভব করতে পারে, কেউ পারে না। অনেকে আবার অনুকূল পরিবেশের অভাবে বিকাশ ঘটাতে পারে না তার প্রতিভার। তাদের প্রয়োজন হয় একজন প্রশিক্ষকের, দক্ষ পরিচালকের অথবা কারও আন্তরিক পরামর্শের—যার সান্নিধ্য ও পরিচর্যায় তারা আত্মপরিচয় লাভ করে, সন্ধান পায় আপন শক্তির।

কিন্তু সবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় না। এমন সচেতন অভিভাবক পায় না সবাই। ফলে

উভয় শ্রেণি টানা ৫ অথবা ১০ বছর টিভি দেখার পর যদি তাদের গুণগত মান বিচার করেন, তাহলে কী দেখবেন? কাদেরকে আপনার দক্ষ ও উন্নত মনে হবে? কাদের চিন্তাশৈলী ও কাণ্ডজ্ঞান আপনাকে মুগ্ধ করবে? আপনার বিচারে কারা এগিয়ে থাকবে দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং মানুষের সঙ্গে লেনদেন ঠিক করায়?

অবশ্যই প্রথম শ্রেণির দর্শক। ৫ বা ১০ বছরে আপনি দেখবেন, তাদের কথা বলার দক্ষতা-সহ সার্বিক যোগ্যতা বেড়েছে অনেকখানি। জীবনযুদ্ধে একবিন্দুতে থেমে নেই তারা। খেয়াল করলে দেখবেন, তারা তাদের কথাবার্তায় অনবরত কুরআন-হাদিস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র থেকে রেফারেন্স তুলে ধরছে। তাদের উপস্থাপন শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে সবাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় শ্রেণির দর্শকদের দেখবেন, তাদের যোগ্যতা একই বিন্দুতে থেমে আছে। কথায় কথায় তারা কেবল তুলে ধরে নায়ক-গায়ক ও অভিনয় শিল্পীদের সংলাপ। এর বাইরে তাদের কোনো রকমের পারঙ্গমতা নেই। এ শ্রেণির এক ভদ্রলোক একদিন তার বক্তব্যে বলছিল, 'আল্লাহ বলেছেন, হে আমার বান্দা, চেষ্টা করে যাও; আমিও চেষ্টা করছি তোমার সাথে।' সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে সতর্ক করে বলি, এটি কিন্তু আল্লাহর কথা অথবা কুরআনের আয়াত নয়। লোকটি তখন চুপ হয়ে যায়। মুহূর্তে পালটে যায় তার চেহারার রং।

পরে আমি তার উদ্ধৃতিটি নিয়ে চিন্তা করি। তখন ধরা পড়ে, এটি একটি মিশরীয় প্রবাদ। কোনো এক টিভি-সিরিয়ালে ভদ্রলোক শুনেছিল। সেই থেকে এটি সেঁটে আছে তার মস্তিষ্কে। আর বাস্তবতা এটাই—প্রতিটি পাত্র থেকে তা-ই বের হয়, যা তা ধারণ করে।

এবার আসুন, পত্রিকা ও সাময়িকী পাঠকদের ওপর একটু দৃষ্টিপাত করি। এখানেও দুই শ্রেণির পাঠক পাওয়া যাবে। এক শ্রেণির পাঠক এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, কলাম ও আর্টিকেল পড়ে—যেগুলো তাদের ব্যক্তিগত কাজে আসে, দক্ষতা সৃষ্টি করে এবং সাধারণ জ্ঞানের সমৃদ্ধি বাড়ায়। অপরদিকে আরেক শ্রেণিকে দেখা যাবে, তাদের দৃষ্টি কেবল খেলা আর বিনোদন পাতায় নিবদ্ধ থাকে। এর বাইরে যেন কিছুই ছাপা হয় না পত্রিকায়। সংখ্যার বিচারে এ শ্রেণির পাঠকই বেশি। তাই পত্রিকাগুলোতে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে—খেলা আর বিনোদনমূলক সংবাদ পরিবেশনে কে কার চেয়ে এগিয়ে থাকবে!

আমাদের ঘরের লোকজন, ঘরোয়া বৈঠক এবং অবসর সময় যাপনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিদ্যমান।

এজন্যই বলি, গাছের শাখা না হয়ে শেকড় হতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে দক্ষতার উপাদানগুলো। সুন্দর আগামীর জন্য

থেকে নেমে সামান্য জিরিয়ে নেন আর জামাতের সাথে সালাত পড়ে বাকি কাজে হাত দেন, তাহলে খুবই ভালো হয়। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন।'

লোকটি উত্তর দিল, 'এখনই নামছি।'

এ কথা বলে লোকটি নেমে এল। আব্দুল্লাহর সাথে মুসাফা করতে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, 'এমন ভদ্র আচরণের জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে যে লোকটি যুহরের সময় এদিক দিয়ে গিয়েছে, তাকে পেলে দেখে নিতাম!'

শিক্ষা

মানুষের সাথে যে আচরণ করবেন, তার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে, তাদের থেকে ঠিক কোন আচরণটি পেতে যাচ্ছেন।

স্বভাব বদলে ফেলুন

অজ্ঞাত কোনো কারণে অনেকে মনে করে, যে স্বভাব নিয়ে সে জন্মেছে তা আর বদলানো সম্ভব নয়। এটা তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, নিয়তির নিঠুর নিয়ন্ত্রণ—অনেকটা গায়ের রং আর দেহকাঠামোর মতো। এজন্য ভাগ্যের মতো স্বভাবের কাছেও তারা আত্মসমর্পণ করে। নিজের যা আছে, তা নিয়েই পরিতুষ্ট থাকে। অবস্থার উন্নতিকল্পে তেমন ভাবে না।

কিন্তু যারা জ্ঞানী, প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তন যাদের ভেতর আলোড়ন তোলে, তাদের কাছে স্বভাব পরিবর্তন পোশাক বদলের চেয়েও সহজ। কারণ তারা জানে, মানব স্বভাব মাটিতে ঢেলে পড়া দুধের মতো নয়—যা কেউ চাইলেও আর পাত্রে তুলে আনতে পারে না। স্বভাব তো আমাদের হাতের মুঠোয়। একটু চেষ্টা করলেই একে পরিবর্তন করে ইতিবাচক খাতে প্রবাহিত করতে পারি। শুধু তা-ই নয়, আমরা চাইলে মানুষের চিন্তার গতিপ্রকৃতি পর্যন্ত বদলে ফেলতে পারি নিজেদের ইচ্ছামতো।

ইবনু হাযম তার *তাওকুল হামাম* গ্রন্থে লিখেন—

‘স্পেনে এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিল। কোনো এক কারণে চারজন ধূর্ত ব্যবসায়ীর সাথে তার বিবাদ দেখা দেয়। হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয়—যেকোনো মূল্যে তাকে উচিত শিক্ষা দেবে। একদিন সকালে ওই ব্যবসায়ী দোকানের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়। তখন তার পরনে ছিল একটি সাদা জামা ও সাদা পাগড়ি। সে কিছুদূর যেতেই ওই চারজনের প্রথমজন এসে তাকে সালাম করে। এরপর তার পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, ‘এই হলুদ পাগড়িতে আপনাকে দারুণ মানিয়েছে।’ ব্যবসায়ীটি তখন বলে, ‘তুমি কি অন্ধ? দেখছ না, এটি একটি সাদা পাগড়ি।’ লোকটি বলে, ‘না, এটি হলুদ পাগড়িই। তবে আপনাকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে।’

এরপর ব্যবসায়ীটি আরও কিছুদূর এগোলে দ্বিতীয়জন এসে তাকে সালাম করে। তারপর কুশল জিজ্ঞাসার একপর্যায়ে তার পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আরে বাহ! আজ তো আপনাকে দারুণ লাগছে। গায়ে সাদা পোশাক, মাথায় সবুজ পাগড়ি—দারুণ মানিয়েছে আপনাকে!' ব্যবসায়ী লোকটি কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলে, 'আরে ভাই, এটা সবুজ নয়, সাদা পাগড়ি।' লোকটি বলে, 'না, সবুজ।' ব্যবসায়ী বলে, 'না, সাদা। দূর হও তুমি আমার এখান থেকে।'

বেচারা ব্যবসায়ী বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে চলে। চলতে চলতে বারবার কাঁধের ওপর পাগড়ির ঝুলে থাকা অংশের দিকে তাকায় আর বলে, 'কই, পাগড়ি তো সাদাই।' কিছুক্ষণ পর সে দোকানে পৌঁছে যায়। তালা খুলতে যাবে ঠিক এমন সময় তৃতীয়জন এসে হাজির। বলে, 'আজকের সকালটা দারুণ সুন্দর। আপনার পোশাক-আশাক যেন তার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই নীল পাগড়ির কারণে আপনার থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না।'

ব্যবসায়ীটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য পাগড়ির দিকে তাকায়। তার কাছে সাদাই মনে হয় পাগড়ির রং। কিছুক্ষণ চোখ কচলে আবার তাকায়। এরপর প্রচণ্ড বিরক্ত গলায় বলে, 'আরে ভাই, আমার পাগড়ি সাদা।' লোকটি বলে, 'আরে না। নীলই তো। তবে আপনার মন খারাপ করার কিছু নেই। আপনাকে বেশ মানিয়েছে এই নীল পাগড়িতে।' এ কথা বলে লোকটি চলে যায়।

এদিকে ব্যবসায়ীটি বারবার তার পাগড়িটি নেড়েচেড়ে দেখে আর বলতে থাকে, 'এরা সবাই কি পাগল? পাগড়িটি তো সাদাই দেখছি।'

এরই মধ্যে চতুর্থজন এসে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। সে গলায় রস ঢেলে জিজ্ঞেস করে, 'মাশাআল্লাহ! এত সুন্দর লাল পাগড়িটা আপনি কোত্থেকে কিনেছেন?' ব্যবসায়ীটি চিৎকার করে বলে, 'না, আমার পাগড়ি নীল।' আগন্তুক বলে, 'না, আমি তো লালই দেখছি। ব্যবসায়ীটি এবার পাগলের মতো করতে থাকে, 'না, আমার পাগড়ি সবুজ। না-না, সাদা। না-না, নীল। না-না, কালো...।'

এরপর থেকে সে এই হাসে, এই কাঁদে; একটু চুপ করে থেকে পরক্ষণেই খেঁকিয়ে ওঠে, অকারণে ছোটাছুটি করে পথেঘাটে।'

ইবনু হাযম এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'এ ঘটনার পর আমি ওই ব্যবসায়ীকে পাগল হয়ে স্পেনের পথে পথে ঘুরতে দেখেছি। বাচ্চারা তাকে দেখলে ঢিল ছুড়ে মারত।'

চারজন ধূর্ত লোক যদি তাদের চাতুর্য কাজে লাগিয়ে একজন মানুষের স্বভাব বদলে দিতে পারে; বরং বিগড়ে দিতে পারে তার মস্তিষ্ক—তবে আপনি কেন পারবেন না

কুরআন-হাদিস থেকে আহরিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেকে সাফল্যমণ্ডিত করতে—বিশেষত আল্লাহ যখন এ দক্ষতা অর্জন ও তার চর্চাকে আপনার জন্য ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছেন?

তাই জীবনে সুখী ও সফল হতে আপনার অর্জিত দক্ষতাগুলো কাজে লাগান। নিজেকে বদলানো সম্ভব নয়—দয়া করে এই খোঁড়া যুক্তি দেওয়া বাদ দিন। তারপরও যদি মনে হয় আপনি পারবেন না, তবে আমি বিনয়ের সঙ্গে বলব—একবার অন্তত চেষ্টা তো করে দেখুন! আর যদি বলেন, আপনার উপায় জানা নেই, তবে বলব, শিখুন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করতে হয় লেখাপড়ার মাধ্যমে। আর ধৈর্য শিখতে হয় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে।'[১]

দৃষ্টিভঙ্গি

মহান তো সে, যে শুধু নিজের দক্ষতারই মানোন্নয়ন করে না; বরং তার চারপাশের মানুষদের দক্ষতা বাড়াতেও কাজ করে। অনেক সময় বদলে দেয় তাদের সহজাত স্বভাব ও চিন্তার গতিপথও।

[১] *আল-মুজামুল কাবির* : ২৬৬৩; *সহিহুল জামি* : ২৩২৬; *মুসনাদুশ শামিয়িন* : ২১০৩; *শুআবুল ঈমান* : ১০২৫৪; হাদিসটির সনদ হাসান।

হতে হবে সবার সেরা

অনেক সময় দেখা যায়, দুজন মানুষ একটি বিষয়ে বিতর্ক করছে। হয়তো উভয়েই সুন্দর একটি সমাধান চাইছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের সে বিতর্ক পর্যবসিত হচ্ছে অমীমাংসিত বিবাদে। আবার এমন বিতার্কিকও দেখা যায়, যারা বিতর্ক করে ঠিক, তবে তাদের সে বিতর্ক শেষ হয় সমঝোতা ও সমন্বিত একটি সমাধান আহরণের মধ্য দিয়ে। বিতর্ক বা কথা বলার দক্ষতা মূলত এখানেই।

আপনি এমনও দেখে থাকবেন, দুজন বক্তা একই বিষয়ে বক্তৃতা করছে। তাদের ব্যবহৃত শব্দ-বাক্য হুবহু এক অথবা কাছাকাছি। তবু তাদের একজনের বক্তৃতার সময় শ্রোতারা ঘনঘন হাই তোলে। অনেকে ঝিমায়। পরনের কাপড় অথবা জায়নামাজ নেড়েচেড়ে সময় পার করে কেউ কেউ। ক্লান্তিতে বারবার বসার ধরন বদলাতে থাকে। কিন্তু অপরজনের বক্তৃতা শোনে বিমুগ্ধ হয়ে। মুহূর্তের জন্যও কেউ অন্যমনস্ক হয় না। ঘুমের চাপও দেখা যায় না কারও মধ্যে।

কেন এমন হয়? কেন একজনের বিতর্ক বিবাদের জন্ম দেয়—যেখানে অন্যজন বিতর্কের মধ্য দিয়ে ঠিকই সমাধানের পথ খুঁজে পায়? কেন একজনের বক্তৃতার সময় শ্রোতারা আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়, মোবাইলে মেসেজ পড়ে সময় পার করে—যেখানে অন্যজন কথা বললে সবাই মন দিয়ে শোনে; বিমোহিত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে আলোচকের প্রতি?

কেন এমন হয়?

কথা বলার দক্ষতার কারণে।

আপনার যদি দক্ষতা থাকে এবং সেটা কাজে লাগাতে পারেন, তবে সফলতা পদচুম্বন করবেই। কিন্তু কারও অবস্থা যদি হয় এর ব্যতিক্রম, তবে ব্যর্থতাই সেখানে শেষ কথা।

আপনার এমন অভিজ্ঞতাও হয়তো থেকে থাকবে, একজন শিক্ষক স্কুলের করিডোর দিয়ে অফিসকক্ষে অথবা ক্লাসরুমে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা তাকে ঘিরে ধরছে। কেউ তার সাথে মুসাফা করছে। কেউ পরামর্শ চাইছে। কেউ-বা আবার সমস্যার কথা তুলে ধরে জানতে চাইছে সমাধান। তিনি যেদিক দিয়েই যাচ্ছেন, হইচই পড়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অফিসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলে মুহূর্তেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অফিসকক্ষ। সবাই তার সঙ্গ পেতে আকুল, তার দুটো কথা শুনতে ব্যাকুল।

ঠিক একই সময়ে একই স্কুলের আরেকজন শিক্ষক সম্পূর্ণ একা। কোনো শিক্ষার্থী তার কাছে ভিড়ে না। চাইতে আসে না কোনো পরামর্শ। মুসাফার জন্য হাত বাড়ায় না। অভিযোগও জানায় না কোনো ব্যাপারে। তাকে সবসময় নিঃসঙ্গ থাকতে হয়। তিনি যদি সারা দিন অফিস খুলে বসে থাকেন এবং দরজায় বড় করে লিখে রাখেন—সবার জন্য প্রবেশাধিকার অবারিত—তবু কেউ তার কাছে যাওয়ার গরজ করে না।

কেন এমন হয়?

আচরণ-দক্ষতার কারণে।

একজন মানুষ কোনো বৈঠকে উপস্থিত হলে সবাই তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তার সাক্ষাতে আনন্দিত হয়। মনে মনে কামনা করে—ইশ, ভদ্রলোক যদি আমার পাশে এসে বসতেন! কিন্তু ঠিক একই সময়ে একই পদের আরেকজন সেখানে উপস্থিত হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। লোকজন নিয়ম রক্ষার্থে শীতল অভ্যর্থনা দেয়। এরপর তাকে বসতে দেওয়ার জন্য একটি খালি আসন খোঁজে। কিন্তু কেউ তার জন্য নিজের আসনটি ছাড়তে চায় না। এমনকি পাশের খালি আসনটিতে সে বসুক—এটাও কেউ চায় না।

কেন এমন হয়?

আচরণ-দক্ষতার কারণে, যা দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া যায় এবং প্রভাব বিস্তার করা যায় তাদের ওপর।

একজন বাবা বাইরে থেকে ঘরে এলে ছেলেমেয়েরা তাকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। কাছেপিঠে থাকে সবসময়। অপরদিকে আরেকজন বাবা বাসায় ফিরলে ছেলেমেয়েরা তটস্থ হয়ে থাকে। ফিরেও তাকায় না তার দিকে। কাছে আসার কথা ভাবতেও পারে না তারা।

উভয়েই তো বাবা। তারপরও কেন এমন হয়?

আচরণ-দক্ষতার কারণে।